সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা

রণেশ দাশগুপ্ত

উনিশশ' ছেচল্লিশের কলকাতা মহানগরী '৪৫-৪৬ এর উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবীতে উত্তাল গণঅভ্যুত্থানের মর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে হরতালের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ পেয়েছিল গণঐক্যের মহাবৈপ্লবিক সম্ভাবনা। এই বৈপ্লবিক সংহতির মধ্যে আঘাত হানার মতলব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী কায়েমী স্বার্থের চক্র যোগসাজশ করে এই অতর্কিত দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত না থাকলেও কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী গণতন্ত্রী স্বাধীনতাব্রতীরা সাধ্যমতো প্রতিরোধ করেছিলেন। এই দাঙ্গাবিরোধী কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে যুক্ত তরুণ কমিউনিস্ট যুবা অসীম রায় তৎক্ষণাৎ একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখেছিলেন ছেচল্লিশের কলকাতা নিয়ে। এই উপন্যাসের নাম 'একালের কথা।' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সম্মিলিত অসাম্প্রদায়িক অবস্থান ছিল এই উপন্যাসের মূলমর্ম।

এই অসীম রায়ই পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ করে ছোট গল্পের লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯৮১ সালে কলকাতার মণীষা প্রকাশনী 'অসীম রায়ের গল্প' নাম দিয়ে যা বের করেছে, তাতে ষাট ও সত্তর দশকের বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার এবং সেই সঙ্গে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাধারণভাবে বামপন্থী কমিউনিস্টদের গণঅভ্যুত্থান প্রয়াসের নায়ক-নায়িকাদের প্রত্যাশা ও যন্ত্রণায় মথিত দিবারাত্রির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'ঝাড়পোছ' এই গল্পমালার একটি স্তবক।

এই গল্পটিতে নায়ক এককালের প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র এবং ঘটনাকালে বামপন্থী কমিউনিস্ট ঝড়ের পাখি। ৪৮ সালে কলকাতা এবং ঢাকার যুগপৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনে তাঁর হাতেখড়ি। তবে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছেছে এই কাহিনী স্মৃতি-বিস্মৃতির ধারায়। তখন নায়ক অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে শাঁসালো চাকরি ও ঘরসংসারে ব্যস্ত। '৪৮-এর কর্মকাণ্ডকে মনে হচ্ছে অবান্তর। সুতরাং বই-এর শেলফ ঝেড়ে পুরানো বই কাগজপত্র বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নায়ক। হঠাৎ রাতে ঘুম থেকে উঠে শেলফের কাগজ বইপত্র বাছতে বাছতে সে সিদ্ধান্ত করলো, কিছু রেখে দেবে স্মৃতি হিসেবে। এই দোটানার ব্যাপারটা দিয়ে গল্প শেষ।

কিন্তু এ গল্পের কি শেষ আছে? এই ঝাড়পোছ আর এর কুশীলবদের ধরে রাখবে কি শুধু স্মৃতিকথা? ঝাড়পোছ দুই বাংলারই আশির এবং সমাগত নব্বইয়ের দশকের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জড়িত প্রজন্মের কর্মে ও মানসে কি কোনো বিবেচনার ইঙ্গিত বা পাথেয় রয়েছে নি? অসীম রায়ের সৃষ্টি আর সাধনার সার্থকতা আজ ও আগামীতে কীভাবে নির্ণীত হবে? পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকের 'রক্তে বোনা ধান' নিয়ে নব্বইয়ের দশকের সাম্যবাদী বিবেচনার মেলবন্ধন অসীম রায়ের উপস্থাপিত দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির ছবি ও ভাবনায় আলোকিত ফেলে আসা ঘটনাবলিকে কীভাবে নেবে? ঝাড়পোছের বর্জন ও বহাল রাখার ইঙ্গিত ও পাথেয়র ব্যাপারে আমরা তাঁর সমসাময়িক আরো কয়েকজনের কাজের ধারা থেকে সূত্র নিলে আমাদের প্রশ্নের জবাবটা পরিষ্কার বেরিয়ে আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে যেসব মুখ মনে জাগছে তাঁদের একজনের কথা প্রথমে বলা যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। এখানে অবশ্য একটা ভিন্ন মেজাজে এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতায় সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতিফলন ও বিচারকে উপস্থিত করছি সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের রেখে যাওয়া কাজের একান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে। সত্যেন্দ্রনারায়ণের জন্ম ১৯১০ মৃত্যু ১৯৮৯তে। স্বাধীনতা সংগ্রামীর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবন। ব্রিটিশ আমলে কারাগারে কাটিয়েছেন '৩৪ সাল থেকে '৪৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৭ সালে আন্দামান সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট হন। '৪৬ সালে দার্জিলিং জেলায় কমিউনিস্ট পার্টি এবং চা শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। '৪৯ থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত জেলে। রাজ্যসভায় সদস্য '৫২ এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য '৫৭ থেকে '৬২ সাল। এই সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেই আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে নেপালী ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। লোক সংস্কৃতি ও জাতি সমস্যার গভীরে গিয়েছেন। কয়েকটি নিবন্ধ-গ্রন্থে ধরা রয়েছে শতাব্দীর সমাজতন্ত্রী-সাম্যবাদী, জাতীয় মুক্তি আর গণতান্ত্রিক জনউত্থানের চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টির সাধনা। বইগুলোর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা, মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা. Marxism and the Language Problem in India. In Search of a Revolutionary Ideology (আত্মজীবনী), মৌনমুখর সেলুলার জেল, আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা, রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার।

এই সাথেই স্মরণীয়, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ছিলেন 'মূল্যায়ন' পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা ও কর্ণধার। অর্থাৎ জড়িত ছিলেন সমবেত মার্কসীয়-লেনিনীয় নিরীক্ষায় মতামত বিনিময় করে মতামত স্থির করার ধারায়। এখানে শুধু একটা ধারণাই মাত্র করা যায় — জাতীয় মুক্তিসংগ্রামী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার ভাবনা নিয়ে কত ব্যাপক প্রস্তুতিসমেত আন্দোলনে ও সংগঠনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তবু একটা সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে খুব পরিষ্কার করেই। সমাজতন্ত্রের বা কমিউনিজমের বিশ্বজোড়া তাগিদ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জড়িত হয়ে আমাদের উপমহাদেশে তথা বাংলায় তথা দুই বাংলাতে কোনো রকমের মৌসুমি ফ্যাশন বা হুজুগরূপে আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ করে নি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসন, শোষণ

এবং দখলদারির সামরিক রাজনৈতিক বেষ্টনী ভাঙার জন্য জনগণের অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়া ও লক্ষ্যের মর্মকেন্দ্ররূপে বিন্যস্ত ও উৎসারিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের চিন্তা ও প্রকল্প। ভুলের, বিভ্রান্তির, যান্ত্রিকতার, অনুকরণসর্বস্বতার, গাফিলতির, আত্মতুষ্টির, বিকৃতির মাশুল দিতে হয়েছে পদে পদে। ঘটাতে হয়েছে সূত্রবদ্ধ মার্কসীয়-লেনিনীয় ভাবনার প্রসঙ্গ স্বকীয় চিন্তার উদ্ভাবনে। ভাঙাভাঙি ও ভাগাভাগির মধ্যেও তাই গড়ে উঠেছে সংগ্রাম ও সাধনার সাফল্য, সার্থকতার ভিত্তি; প্রসারিতও হয়েছে এই ভিত্তি।

উপরিউক্ত 'ঝাড়পোছ' এবং কর্মকাণ্ডের ধারা দেখিয়ে দিচ্ছে সাম্যবাদী মেলবন্ধনের কথাটা স্বপ্নকল্পনা নয়। দৃষ্টান্ত দুটোই এক কথায় বলতে গেলে ঘরোয়া। এবার তাই দুটো দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি কিছুটা দূর-দূরান্তের, যদিও একই গোত্রের।

প্রথমেই উল্লেখ করবো, '৮০-র দশকের শুরুতে হাতে এসেছিল একটি বই। লেখক ফেলিক্স গ্রীন (Felix Green)। বইটির নাম 'শত্রু (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ)' The Enemy (US Imperialism)। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ভাঙাভাঙির মধ্যেও যে এরকমের একটি চরিত্র এবং এমন ধরনের চিন্তা সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্রের মহলে সম্ভবপর হতে পেরেছে, সেটা প্রহেলিকার মতো মনে হয়েছিল বইটি পড়ে। ফেলিক্স গ্রীনের এই উপস্থাপনটি হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সারমর্ম লিখে রেখেছিলাম ডায়েরিতে। এখানে সেই কথাগুলো হুবহু সাজিয়ে দিচ্ছি।

ফেলিক্স গ্রীন শান্তি আন্দোলনের প্রসঙ্গে 'ইলিউশন অ্যান্ড রিয়ালিটি'র লেখক এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে স্পেনে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে এবং ফ্যাসিবাদী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর হানাদারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ ক্রিস্টোফার কডওয়েলের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দাখিল করেছেন। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এই কডওয়েলের বক্তব্যকে গ্রীন বড় মাত্রায় উপস্থিত করেছেন।

ফেলিক্স গ্রীন তাঁর বইটিতে কার্ল মার্কসের লেখা থেকে যেসব প্রসঙ্গ টেনেছেন, সেখানে রয়েছে মার্কসের চিন্তা-ভাবনার প্রতি গভীর আস্থা ও একাত্মতা। তিনি সেই সমস্ত পশ্চিমা অর্থনীতিবিদকে নিয়ে পরিহাস করেছেন, যাঁরা 'শোষণ' ও 'শ্রেণী'র মতো কথাগুলোকে পরিহার করে চলেন, কারণ, এই সমস্ত কথা কার্ল মার্কস ব্যবহার করেছেন। ফেলিক্স লিখেছেন, মার্কস ছিলেন এমন একজন মহান লেখক ও সংগ্রামী যাঁর বক্তব্য সবসময়েই বিষয়ানুগ থাকতো।

ফেলিক্স গ্রীনের যেসব মতামত তাঁর বইতে ব্যক্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় তিনি একদিকে মাও-সে-তুঙের অনুসারী আবার সেই সঙ্গেই ভিয়েতনাম ও কাস্ত্রোর সমর্থক। এরই পাশাপাশি তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী অক্টোবর বিপ্লবের প্রবক্তা। ফেলিক্স গ্রীনের গর্ব, বিশ্বে প্রথম মহাকাশে নভোচারী পাঠিয়েছে অক্টোবর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে অধিকারী হয়ে ওঠা শ্রমজীবী মানুষেরা।

ফেলিক্স গ্রীনের আরেকটা পরিচয় এই যে, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্রকর। ছবি করেছেন গণচীন এবং ভিয়েতনাম নিয়ে।

হয়তো আমরা আমাদের কঠোর পক্ষাপক্ষ বিচারের দরুন ফেলিক্স গ্রীনের তাত্ত্বিক কাজ এবং ছবি তৈরির ব্যাপারটাকে আমলে আনি নি। কিন্তু এই ব্যক্তিটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁর কাজ তিনি করে গিয়েছেন, বক্তব্য বলে গিয়েছেন। সেই বক্তব্য ও কাজ হচ্ছে অপক্ষপাতিত্বের। মেলবন্ধন ঘটানোর। আজ আমরা বুঝতে পারছি এই সাম্যবাদী মেলবন্ধনের প্রয়োজন কত সুদূরপ্রসারী। এই সঙ্গেই আমরা নিশ্চয় সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এই ধরনের অন্তঃসলিলার মতো ভাবনা-চিন্তা ও সৃষ্টির ধারা নিয়ে

অনেকেই কাজ করেছেন। আজ তাই যখন বিভ্রান্তি ও যান্ত্রিকতার দরুন যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করে নেওয়ার জন্য খুঁজে বের করতে হবে ফেলিক্স গ্রীনের বর্তমান উপস্থিতি ও অবস্থিতিকে এবং সেই সঙ্গে এই ধরনের আরো অসংখ্য কর্মীকে এবং তাঁদের সৃষ্টিকে। শরিক করে নিতে হবে এঁদের সর্বাত্মকভাবে। এই সূত্রেই উপস্থিত করছি আরেকটি দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত পাবলো নেরুদা।

ঢাকার জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৭৯ সালে চিলি তথা লাতিন আমেরিকার সাম্যবাদী মহাকবি পাবলো নেরুদার রচনা নিয়ে 'আত্মস্মৃতি ও কয়েকটি কবিতা' নাম দিয়ে একটি বই প্রকাশ করে। ১৯৮৭তে-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরিয়েছে। এতে ১৯৭৩ সালে পাবলো নেরুদার মৃত্যুর আগে লিখে রেখে যাওয়া 'আত্মস্মৃতি' এবং 'কাঠুরেরা জেগে উঠুক'-এর কিছু বিখ্যাত কবিতার বাংলা ভাষ্য রয়েছে। আত্মস্মৃতির অনুবাদ করেছেন মোজাম্মেল হোসেন। কবিতার অনুবাদকেরা হলেন শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, মফিদুল হক ও খান মোহাম্মদ ফারাবী।

এখানে আমাদের সাম্যবাদী-সমাজতন্ত্রী মেলবন্ধন যে রকে বোনা ধানে উৎসারিত রয়েছে, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে নেরুদার আত্মস্মৃতি থেকে দুটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করছি।

(১) "কমিউনিস্টদের উপর যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছে হাজার হাজার শ্রমিক যাদের অধিকাংশই পড়তে-লিখতে জানত না তা শুরু হয়েছিল লুই এমিলিও রেকাবারেনের নেতৃত্বে, যিনি এই (অর্থাৎ চিলির) দগ্ধ প্রান্তর থেকেই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ও পাঁড় নৈরাজ্যবাদী থেকে তিনি একজন রূপকথার নায়কে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে, যিনি সমগ্র এলাকাকে শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশনে গেঁথে দিয়েছিলেন এবং ১০টিরও বেশি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানত তাঁর নবগঠিত সংগঠনগুলোরই সমর্থনে। এবং এসবই করেছিলেন একটি কপর্দক ছাড়া, এইসব সংগঠনেরই মাধ্যমে কিন্তু প্রধানত শ্রমিকদের চাঁদায়।"

(২) "১৯৭০-এর এক সকালবেলায় আমার পার্টির (অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির) সাধারণ সম্পাদক ও আরো কয়েকজন কমরেড আমার সাগর তীরের বাসায় দেখা করতে এলেন। আমাকে (চিলির) প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তাঁরা প্রস্তাব দিলেন। এছাড়া উপায় ছিল না। (সেই মুহূর্তে ঐক্যভিত্তিক কোনো বিকল্প ছিল না।) আমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। বিরাট সাড়া পড়ে গেলো — কিন্তু আনন্দপূর্ণ সংবাদ এলো যে খুব সম্ভব আলেন্দে পপুলার ইউনিটি ব্লকের প্রার্থী হবেন। সেই মুহূর্তে আলেন্দের সমর্থনে আমার মনোনয়ন প্রত্যাহার করলাম।"

অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সমর্থন পেলেন সমাজতন্ত্রী জননায়ক সালভাদর আলেন্দের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে। আলেন্দে জয়ী হলেন। ১৯৭৩ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুচর সামরিক চক্র আলেন্দেকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করলো। মৃত্যুশয্যাশায়ী কবিকে গৃহবন্দি করলো। নেরুদারও মৃত্যু হলো এই '৭৩ সালেই। কিন্তু চিলি আবার সামরিক চক্রের শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে, এমন সময়ে যখন পশ্চিম গোলার্ধে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র বিপর্যয়ে পড়েছে। এখানে একটি সহজ সরল প্রশ্ন, দুটি দশকের মধ্যেই যখন চিলি গা ঝাড়া দিচ্ছে, তখন ইউরোপ উঠে দাঁড়াবে না? □

[রচনাটির প্রকাশকাল : ১৯৯২]